



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 182 - 188

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মহাশ্বেতা দেবীর ‘সুরজ গাগরাই’ আখ্যানে হো জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন

আমিনুর মিঞা

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কোচবিহার পঞ্চগনন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: aminurm.dta@gmail.com

 0009-0006-5242-5416

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

HO tribe. HO culture. ‘Baha’ festival. ‘Maghe’ festival. Equality. Unity. Solidarity. Justice.

Abstract

Unity in diversity is one of the unique features of Indian society and culture. But this diversity is currently facing destruction due to various reasons. This issue has gained special importance in Mahashweta Devi's impartial perspective. She is like a mother to the marginalized tribal communities. She always stood by the downtrodden. She wielded her pen for their rightful existence and the establishment of their dignity. Mahashweta Devi has created a vast literary treasure about those who are lost, endangered and facing destruction due to the impact of the mainstream of independent Indian society, whose social and cultural fabric has been wounded. ‘Suraj Gagrai’ is a novel of this genre. In it, Mahashweta Devi's thoughts and working methods reflect the strong desire for the establishment of Ho society, culture and their just rights.

Discussion

ভূমিকা : ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা। এখানে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষ বসবাস করে। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব জীবন-জীবিকা-ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদান। এই বিভিন্নতা থাকলেও মানুষের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। কিন্তু স্বাধীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই ঐক্য বিভিন্ন কারণে ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছে। কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীতে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। তিনি ছিলেন অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত, আত-পীড়িত, হতদরিদ্র, প্রান্তিক আদিবাসী জনজাতির জননী স্বরূপ। তিনি সর্বদা সর্বহারা মানুষের পাশে ছিলেন। তাদের জন্য সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কলম ধরেছেন তাদের যথাযোগ্য অস্তিত্ব রক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য। যারা স্বাধীন ভারতীয় সমাজের মূল স্রোতের আঘাতে দিশেহারা, বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, ধ্বংস হতে বসেছে যাদের অস্তিত্ব, তথা সমাজ-সংস্কৃতি, মহাশ্বেতা দেবী তাদের নিয়ে রচনা করেছেন বিপুল সাহিত্য সম্ভার। ‘সুরজ গাগরাই’ তেমন ঘরানার একটি উপন্যাস। যেখানে স্থান পেয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর আদিবাসী হো জনজাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক। এখানে তিনি হো-দের প্রতি সরকার, প্রশাসন,

পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও হৃদয়হীনতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। যে আদিবাসী ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের পরিচয়বাহী, যারা পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে স্বাধীন দেশের নাগরিক। সেই জনজাতি বর্তমানে আধুনিক সভ্য সমাজের আগ্রাসনী লোভের করাল গ্রাসে অস্তিত্বহীনতার পথে। এই অস্তিত্বহীনতার জন্য দায়ী স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসন। অথচ তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে দেশের সকল মানুষ সমান এবং প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে। প্রত্যেকে নিজস্ব জাতি, ধর্ম, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা অন্যরকম। তাই মহাশ্বেতা দেবীর চিন্তা ও কর্ম প্রণালীর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে সমতা, ন্যায়-নীতি ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক মাত্রই প্রাণের সুস্বপ্ন স্পন্দন অনুভব করতে পারে মহাশ্বেতা দেবীর ‘সুরজ গাগরাই’ উপন্যাসে।

গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী ও উদ্দেশ্য : মহাশ্বেতা দেবীর ‘সুরজ গাগরাই’ উপন্যাসে ‘হো’ জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা আলোচনা করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া তিনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই আখ্যান রচনা করেছেন এবং কেন হো-দের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে আখ্যান নির্মিত করেছেন, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

গবেষণা পদ্ধতি : এই গবেষণা সন্দর্ভটি সূক্ষ্ম ও নিবিড়ভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রধানত বর্ণনামূলক এবং প্রয়োজনে ব্যাখ্যামূলক ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ : মানবসমাজের প্রতি গভীর অনুরাগ, দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, আত্মপ্রকাশে দীপ্ত ও সত্য প্রকাশের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং জনকল্যাণকর প্রেরণা নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। দেশ-কাল-সমাজ সচেতন মহাশ্বেতা সেইরূপ গভীর অনুরাগ সহযোগে আদিবাসী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদান নিয়ে রচনা করেছেন ‘সুরজ গাগরাই’ (১৯৮৩) উপন্যাস। আখ্যানে তিনি স্বাধীন ভারতীয় দেশ-কাল ও সময়ের প্রেক্ষাপটে হো জনজাতির আর্থসামাজিক সমাজবাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক রূপ উন্মোচিত করেছেন। হো-রা অনার্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার বহু পূর্ব থেকে বিভিন্ন অনার্য জাতির মানুষ এদেশে এসে বসবাস করত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নেগ্রিটো, প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড, মঙ্গোলয়েড, দ্রাবিড় প্রভৃতি। আর্যরা ভারতে প্রবেশের প্রথমদিকে এইসব অনার্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কিছু অনার্য আর্যদের দাস বা দস্যু হিসাবে স্থান পেয়েছিল, অন্যরা পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল অরণ্যে। পরবর্তী সময়ে অরণ্যে বসবাসকারী অনার্যরা ‘বনবাসী’ নামে পরিচয় লাভ করে। আর্যদের আসার বহু বছর আগে এরা পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতে এসেছিল। বর্তমানে রাঢ় বাংলা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এদের অবস্থান লক্ষ করা যায়। কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাওঁ, হো, শবর, চেঞ্চু, কুরুব প্রভৃতি এই অনার্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

‘সুরজ গাগরাই’ উপন্যাসের পটভূমি তৎকালীন বিহার তথা বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত সিংভূম অঞ্চল। মহাশ্বেতা দেবী সিংভূম অঞ্চলকে কোলহান বা কোলদের দেশ বলে অভিহিত করেছেন—

“কোলহান যাকে বলছি, তা হল সিংভূম। ওটা কোলদের দেশ। সায়েবরা সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, সকলকেই ‘কোল’ বলে গেছে। তবে ‘হো’-দের কোল বলাই ঠিক।”

এখানে মহাশ্বেতা দেবী পষ্টভাবে হো-দের কোল বলে অভিহিত করেছেন। এই কোল জনজাতি নিয়ে গুণীজনদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ ‘ভারতের আদিবাসী’ গ্রন্থে কোল জনজাতিকে মুণ্ডা বা ওঁরাও নয়, ভিন্ন একটি জনগোষ্ঠীকে কোল বলে নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি আরও বলেছেন ১৯৩১ সালের আদম সুমারির তথ্য অনুযায়ী কোল জাতির বাসস্থান মধ্য ভারতের ‘রেওয়া রাজ্য’ এবং এদের জনসংখ্যা ২,০০,২৪৯ জন। অন্যদিকে কোল জনজাতি সম্পর্কে ‘ভারতীয় আদিবাসী’ গ্রন্থে অমলকুমার মণ্ডল বলেছেন—

“ইতিহাসে আমরা কোল জাতির নাম পাই। এরা কতগুলো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত নাম। কোলরা একক কোনো আদিবাসী সম্প্রদায় নয়। কর্ণেল ডালটন, উইলিয়াম হান্টার, ওয়ালটার ডি গ্রিফিথস্, জেলিংহামস্ প্রমুখ পণ্ডিতরা কোলবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। আমাদের সাহিত্য সম্রাট

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালির উৎপত্তি-বিষয়ক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন - হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল। হো জাতিকে লড়কা বা লড়াইয়া কোল বলে।”^২

‘আদিবাসী জীবন ও সংগ্রাম’ গ্রন্থে অরুণ চৌধুরী বলেছেন—

“বর্তমান বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর বিভাগে কোল জনজাতির বাস। এঁরা হো, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত। ছোটনাগপুর বিভাগের দুই হাজার বর্গমাইলব্যাপী কোলহান অঞ্চলে তাঁরা বহুকাল ধরে বসবাস করে। ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত এখানকার জনজাতিগুলি অনেকখানি রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ভোগ করতেন।”^৩

যাইহোক, কোল জনজাতি যে একক জনগোষ্ঠী নয়, তা নিশ্চিত। কোলরা কয়েকটি আদিবাসী জনজাতির সম্মিলিত রূপ। হো জনজাতি তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের আলোচ্য এই হো জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে। মহাশ্বেতা দেবী আখ্যানে হো জনজাতিকে কোল বা কোলহানবাসী বলে স্বীকার করেছেন। এই জনজাতি অনার্য প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক সুবোধ ঘোষ ‘ভারতের আদিবাসী’ গ্রন্থে ১৯৩১ সালের আদম সুমারির প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখ করেছেন, যেখানে বিহার এবং ওড়িশায় হো জনজাতির সংখ্যা ছিল ৫,২৩,১৫৮ জন। ইতিহাসবিদ শুচিরত্ন সেন ‘ভারতের আদিবাসী’ গ্রন্থে হো জনজাতির সমাজ-সংস্কৃতি নিয়েও সম্যক আলোচনা করেছেন। তিনি Human থেকে ‘হো’ শব্দের উৎপত্তি বলে গ্রহণ করেছেন। হো-রা নিজেদের ভাষাকে হো কাজি বা হো হারাম বলে। এটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি হো-দের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন —

“হো জনজাতির অবস্থান মূলত সিংভূম, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও নেপালের কিছু অংশে। সংখ্যাগত দিক থেকে সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং ওরাওঁদের পরেই হো-দের অবস্থান। সিডিউলড ট্রাইবদের মধ্যে এদের সংখ্যা ১০.৫ শতাংশ। ২০০১-এর জনগণনা অনুসারে ঝাড়খণ্ডে এদের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। ওড়িশায় হো ভাষায় কথা বলেন প্রায় ২ লক্ষ মানুষ। ধর্মের ক্ষেত্রে হো-রা নিজেদের অন্য ধর্মের থেকে পৃথক বলে মনে করে এবং তারা সরণা ধর্মের অনুগামী।”^৪

স্বাধীন ভারতীয় সমাজের মূলস্রোত থেকে হো-রা অনেকটা পিছিয়ে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এই মানুষেরা গ্রাম্য সমাজ ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেই দিনযাপন করে। স্বাধীন ভারতীয় সংবিধান অনুসারে হো-রা তফশিলি জনজাতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত অনগ্রসরতা দূর করার জন্য বিশেষ সুবিধা ও সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এদের সমাজ ও সংস্কৃতি হল আদিম। এদের সবার মাথা হচ্ছে গ্রামপ্রধান। তিনি সবার প্রিয় এবং সম্মানিত ব্যক্তি। সবাই তাকে মান্য করে চলে। সমাজের মানুষের ভাল-মন্দ, বিপদ-আপদ ইত্যাদিতে তিনি যেমন বিচার বিবেচনা করেন, তেমনি উৎসবে-অনুষ্ঠানে তাঁর স্থান সাধারণের থেকে অনেক উচ্ছে। আখ্যানে পরিলক্ষিত হয় সুরজের পিতামহ মাটা গাগরাই রামপুর ক্রীড়াকেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

হো-দের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ ও বনজ সম্পদ। সিংভূমের গোরো জমিতে তারা চাষ করে ধান ও সরগুজা, মুগ, উরুদ প্রভৃতি খাদ্যশস্য। আর বন থেকে সংগ্রহ করে কাঠ, লতা, কন্দমূল, ফলবীজ, চিরঞ্জি, মৌয়া প্রভৃতি। যা তাদের খিদে মেটানোর পাশাপাশি অর্থের জোগান দেয়। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো অরণ্য এদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ—

“সিংভূমের জঙ্গল শাল, আম, জাম, মছয়া, টিলাই হারিনহারা, গুলার, আসান গাছে পরিপূর্ণ।”^৫

স্বাধীন ভারতীয় সরকার যখন শাল কেটে সেগুন লাগানোর চেষ্টা করে তখন হো-দের কাছে তীব্র বাধার সম্মুখীন হয়। কারণ সরকার বা দিকুর কাছে শালের চেয়ে সেগুনের দাম প্রচুর। কিন্তু আদিবাসীদের কাছে—

“শাল ওদের গ্রামদেবতা। শালের পাতা, ফুল, ফল, বীজ, ছাল ও কাঠ ওদের হাজার উপায়ে পেটের খিদে মেটায়। হাজার কাজে লাগে। বনভূমিতে শালের অবস্থান স্নেহশীল কর্তব্যজ্ঞের মতো। শালবনের মাটিতে লালিত ও পুষ্ট হয় নানান ঝোপড়া গাছ। লতা, আর কন্দে-মূলে-ফলে গরিবের খিদে মেটে।

সেগুন হল স্বভাবে জমিদার। সে যে বনে জন্মায়, তার মাটিতে আর কোন গাছ-লতা-ঝোপ থাকতে পারে না। জমিদারের কাছে কি সাধারণ লোকজন ঘেঁষতে পারে?”^৬

কোলহানের আদিবাসী সন্তানেরা তাই তাদের গ্রাম দেবতা ও বনভূমি রক্ষার্থে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে। খুটকাটি বনে শাল কেটে সেগুনে লাগানোর বিরুদ্ধে ‘অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চা’ সংগঠন গড়ে প্রতিবাদ করে। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে তির, ধনুক, হাসুয়া, ভেলুয়ার তেল ইত্যাদি।

হো জনজাতির গ্রাম্য পুরোহিত ‘দেউরি’। হো জনজাতির সমস্ত রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান তিনি সম্পন্ন করেন। সুরজ যখন লেখাপড়ার জন্য রামপুর যায় তখন ‘দেউরি’ তাকে আশীর্বাদ করে। এদের অসুখবিসুখ হলে ভাল করে অপদেবতার পুরোহিত ‘দেওনা’। ডাইন বা ভূত ধরলে তা ছাড়ায় ‘সোখা’। আর অসুখ হলে সারাবে ‘দেওনা’। এরা সাধারণত ডাক্তারি চিকিৎসায় আস্থাশীল নয়। তারা মনে করে তাদের লড়াই নেতা অসুস্থ পাগুন জোংকো হাসপাতালে যাওয়ার কারণে মারা যায়।

হো-রা মৃত ব্যক্তির সমাধি দেয়। মৃত দেহকে তারা তেল, হলুদ ও গরম জলে স্নান করায়। গায়ে পড়ায় নতুন কাপড়। মৃতের হাতে তারা একমুঠো ধান দেয় আর নেয়। তিনবারের পর সেই ধান নতুন কাপড়ে বেঁধে রাখে। আগামী বছর তারা সেই ধান বীজধান হিসাবে বপন করে। তারা বিশ্বাস করে এই ধানে ভাল ফসল হয়। এছাড়া মৃতের মুখে পয়সা দেয়, সমাধিতে রাখে মৃতের পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল, ধান, একটি বাটি। তারপর মৃতের ওপর মাটি দিয়ে সমাধি দেয়। মৃতের প্রতি সম্মান জানাতে তারা সমাধির উপর পাথর দিয়ে শ্মশানডির তৈরি করে। তাদের বিশ্বাস যত দূরের পাহাড় থেকে, যত পরিশ্রম করে পাথর আনতে পারবে মৃতের পক্ষে ততবেশি সম্মান জানানো হবে। যেমন গ্রামের প্রধান মাটা গাগরাইয়ের মৃত্যুর পর গ্রামবাসীরা দূর পাহাড় থেকে বহন করে আনে সমাধি পাথর। আবার সুরজের বাবা টাটানগরে মারা যাওয়ায় লাশ গৃহে এনে সমাধি দিতে না পাড়ায় স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ একটি করম গাছ লাগায়। অন্যদিকে মৃত সুরজের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার ছেলে সন্তান না থাকায় তার দেহের সমাধি না দিয়ে চিতায় করে জ্বালিয়ে দেয়।

হো জনজাতির মধ্যে টোটম ও ট্যাবু লক্ষ করা যায়। তারা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক চর্চা করে, যার মাধ্যমে টোটম ও ট্যাবু পরিলক্ষিত হয়। তাদের টোটম-এর প্রতীক হল সিমঝেরা পাহাড়ের প্রাচীন শালগাছ। কোলহান বাসীর কাছে সিমঝেরা পাহাড় ও নীচের শালবন অতি পবিত্র। এই শাল গাছ তাদের কাছে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত। আর ট্যাবু হিসাবে পরিলক্ষিত হয় বসন্ত সমাগমে ‘বাহা’ পরব। তাদের মধ্যে সামাজিক নিষেধ রয়েছে ‘বাহা’ পরব না হওয়া পর্যন্ত তারা জঙ্গল থেকে শালপাতা সংগ্রহ করতে পারবে না এবং তা থেকে থালা তৈরি করাও যাবে না। এ পরব না হওয়া পর্যন্ত তারা খেতে পারবে না বনের ফল। বসন্ত সমাগমে গাছে নতুন ফুল-পাতা দেখা দিলে তারা উৎসব করে ‘বাহা’ পরব। এদের গ্রাম দেবতা শাল। তাই শাল গাছে নতুন ফুল ফুটলে তারা ‘বাহা’ পরব পালন করে—

“এ পরবে গ্রাম-দেবতার পূজা হয় শাল ফুলে, ডিয়াংয়ে, মুরগি বলি দিয়ে। বাহা পরব না হলে শালপাতার থালা বাটি তৈরি করতে নেই, খেতে নেই মছার ফল-ফুল, কোনো জংলা ফল। এ পরবে হো মেয়ে চুলে শাল ফুল পরে নাচে, গান গায়। এ গ্রামের পরব শেষ হলে ও গ্রামে বাজে বাঁশি ও নাগারা।”^৭

হো জনজাতির সবচেয়ে বড়ো উৎসব হল ‘মাঘে’ পরব। মাঘ মাসে শস্য উঠলে তারা পালন করে ‘মাঘে’ পরব। তাই তাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব ‘মাঘে’ পরবে একটি সুপ্রাচীন শাল গাছকে নতুন ধান, ফুল ও মুরগি বলি দিয়ে পূজা করে, তবে গ্রামে পূজা শুরু করে। হো-রা বিশ্বাস করে যতদিন এই পাহাড়, বন ও গাছটির পবিত্রতা থাকবে, ততদিন কোলহানের সন্তানদের ভরসা থাকবে, একদিন ফিরে পাবে প্রাচীন গৌরব। তাই এই জায়গাটিতে কেউ প্রবেশ করে না, গাছও কাটে না। স্বাধীন ভারতে এই জঙ্গল ও পাহাড় রামপুর জঙ্গল মহলের অন্তর্গত। এম এল এ রাওল সাহেব তাই শালবন ডেকে নিয়ে গাছ কাটতে শুরু করলে সিংভূমের পঁচিশটি গ্রামের আদিবাসী হো সমাজ তীর ধনুক নিয়ে প্রতিবাদ জানায় এবং বাঁচিয়ে রাখে নিজেদের পবিত্র সিমঝেরা পাহাড়, শালবন।

হো সমাজের নারীরা অনেক বেশি নীতিনিষ্ঠ এবং স্বাধীন। তারা এক পুরুষে আসক্ত। শত অভাব-অনটন থাকলেও অর্থ বা অলংকারের বিনিময়ে ইজ্জত বিক্রি করে না। নিজেদের ইজ্জত তারা গভীর সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করে। সুরজের মা গঙ্গা উনিশ বছর বয়সে বিধবা হলেও জঙ্গল বাবুদের গহনা, কাপড়ের প্রলোভনে নিজের ইজ্জত হারায়নি। বরং নিজের ইজ্জত বাঁচাতে কোমরে হাসুয়া নিয়ে ঘোরে। তাদের সমাজ মেয়েদের হবু স্বামীর সঙ্গে মেলামেশার স্বীকৃতি প্রদান করে। আখ্যানে পরিলক্ষিত হয় বিয়ের আগে নান্দি সুরজের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়। সুরজ তাকে মেলায় নিয়ে গিয়ে গালার চুড়ি কিনে দেয়। মেয়েরা নীতিনিষ্ঠ ও স্বাধীন হলেও সুরজ ফৌজে গেলে নান্দিকে ‘বাহা’ পরবে বা ‘মাঘে’ পরবে অন্য ছেলের সঙ্গে নাচতে নিষেধ করে। তাদের সমাজে স্ত্রীরা স্বামীদের দাসী নয়, বরং পুরুষের সহযোগী ও সহকর্মী। হো সমাজে স্ত্রী পণপ্রথার প্রচলন রয়েছে। মেয়েরা পাত্রপক্ষের কাছ থেকে পণ বা যৌতুক স্বরূপ গোরু-মোষ-ছাগল দাবি করে। মেয়েরা ভাবে তার পরিশ্রমের অর্থ যেহেতু তার পিতা ভোগ করতে পারবে না, সেহেতু পণের গোরু বা মোষ পেলে পিতার অভাব ঘুচে যাবে। আখ্যানে দেখা যায় এই পণের দাবি মেটাতে অনেক পুরুষ সাউদের কাছে করজ নিতে যায় এবং সাউরা তাদের বিক্রি করে ঠিকাদারের কাছে। ঠিকাদার তাদের দিয়ে খাদানে কাজ করায় এবং মজুরির অর্থ ভোগ করে। খাদানের প্রতিকূল পরিবেশে নারীরা আবার নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে পারে না। এই ভাবে তাদের সমাজ দিকুদের চক্রান্তে শিকারে পরিণত হয় ও নানা ভাবে শোষণ করে। নান্দি তাই বিজ্ঞের মতো সুরজের কাছে বেশি পণ দাবি করে না। সুরজের সামর্থ্য মতো একটি মাত্র মোষ দাবি করে। সুরজ ফৌজে গেলে নান্দি পশুপালন ও চাষ-আবাদ করে অর্থ সঞ্চয় করে।

হো পরিবারে কোন সম্মানিত অতিথি এলে পরিবারের বা পাড়ার আইবুড়ো মেয়ে সেবায়ত্ত্ব করে। কেউ পা ধোয়ায়, কেউ-বা জল এনে দেয়। সাবুই ঘাসের দড়ির বোনা খাটিয়াতে অতিথিকে বসতে দেয়। ভুরা গুড়, গোঁড় লেবুর শরবত খেতে দেয়। ভোজন করায় ভাত, ফ্যানের টাকনা ইত্যাদি সহকারে।

হো-রা আর্থিক দিক থেকে খুবই অস্বচ্ছল এবং দুর্বল। ফলে অপুষ্টি এদের নিত্যসঙ্গী। স্বাধীন ভারতের ভোটার হয়েও এরা নাগরীক জীবন থেকে বঞ্চিত। বঞ্চিত হয় সরকারি সব রকম সুযোগ সবিধা থেকে। সরকার তাদের উন্নতির জন্য কখনো আন্তরিকতা দেখায় না। আদিবাসীদের বিদ্যাশিক্ষার্থে সরকার অর্থ প্রদান করলেও বিদ্যাঙ্গনে পড়াশোনা করে দিকুদের সন্তানেরা। দু-চারটি আদিবাসী ছেলে পড়াশোনা আগ্রহ দেখালেও শিকার হয় জাতপাত, বর্ণবৈষম্যের। শিক্ষা লাভ করলেও সঠিক সময়ে সংবাদ পায় না তাদের জন্য বরাদ্দ চাকরির, নাম লেখাতে পারে না এক্সচেঞ্জ। ফলে তাদের কর্মস্থানে যোগ দেয় অন্য জাতের ছেলেরা।

আদিবাসীদের সামাজিক উন্নতিতে সরকারি অর্থ বরাদ্দ হয়। টাকাও আসে। কিন্তু হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, কুয়ার কাজ কিছুই হয় না। সমস্ত অর্থ যায় এম এল এ ও সরকারি অফিসারের পকেটে। তাদের নিজস্ব বাসভূমি সিংভূম প্রাকৃতিক সম্পদের খনি। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের ‘ক’ থেকে ‘হ’ সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু কোলরা নিজ বাসভূমিতে হয়ে যায় পরবাসী। বহিরাগত দিকুরা সহজ সরল আদিবাসীদের নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে সবকিছু ভোগদখল করে। কোলহানের নিজের সম্পত্তিকে টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া প্রভৃতি বড়ো বড়ো শিল্পপতিরা ভোগ দখল করে নেয়। কোল সন্তানেরা নিজ দেশে ভিখারি হয়ে থাকে। সরকারি কাগজে কলমে সিংভূম আদিবাসীদের রাজ্য হলেও আদিবাসী কোনরূপ তথ্য পায় না। জঙ্গলে আদিবাসীদের পূর্ণ অধিকার, জঙ্গলের ডাক পাওয়ার কথা আদিবাসীদের, ডাকও ওঠে আদিবাসীর নামে। কিন্তু দিকুরা সেটা সরকারি অফিসারদের সঙ্গে পরিকল্পনা করে বেনামে বা ভুয়ো নামে ডাক দিয়ে নিজেরা ভোগদখল করে। পরিবর্তে আদিবাসীদের মাঝে মধ্যে দশ-বিশ টাকা দেয় আর লাখ লাখ টাকা মুনাফা অর্জন করে। এর বিরুদ্ধে আদিবাসীরা এক সময় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আদিবাসী লড়াকু ব্যক্তিত্ব পাণ্ডন জোংকো ‘জঙ্গল কুলি ইউনিয়ন’ গড়ে দশ টাকার পরিবর্তে হাজার টাকা আদায় করে এবং সে-বছর মজুরি পায় তিন টাকা করে। কিন্তু পরের বছর জোংকো মারা গেলে দিকুরা পুরোনো ব্যবস্থা চালু করে। এছাড়া কোলহানের জমি আদিবাসীদের নামে। কিন্তু জমিদার, জোতদার সেগুলি দখল করে থাকে। আর আদিবাসীরা কিছু না জেনে নিজের জমি নিজেই কিনে নেয়। শিক্ষা ও অজ্ঞতার অভাবে এভাবে আদিবাসী হো-রা জঙ্গলের ডাক, জমি কেনা, বনের চিরঞ্জি, মৌয়া বেচতে গিয়ে সর্বদা শোষিত যায়।

স্বাধীন ভারতে নির্বাচনের সময় এই সব অঞ্চলে সমাজের মূল স্রোতের মানুষেরা নিজেদের মতাদর্শে চালিত কোন আদিবাসীকে ব্যক্তিকে ভোটে নির্বাচন করায় এবং আদিবাসীদের উপর শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখে। আদিবাসীরা এসব সহ্য করতে করতে একসময় সংঘবদ্ধ হয়ে নিজস্ব প্রতিনিধিকে দাঁড় করায় এবং তারা মার খায়। আদিবাসী কালু সোমরাই নমিনেশন দাখিলের পরে মার খেয়ে পড়ে থাকে হাসপাতালে। অনেক আদিবাসী গ্রাম ভোটে অংশগ্রহণ না করলেও আদিবাসী প্রতিপক্ষ রাওল সাহেব নির্বাচনে জয়ী হয়।

বিশ শতকের আশির দশকে সরকার সিংভূমে চেরো বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। সরকার ঘোষণা করে “হর ক্ষেত কো পানি, হর হাত কো কাম।”^৮ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে রাজনগর, পোটকা, গামহারিয়া, চাইবাসা, সেরাইকেলা, খুঁটপানি অঞ্চলে দুই লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শো একর কৃষি জমি জল পাবে। কিন্তু এটা ঘোষণা করে না যে আদিবাসী কুড়িটি গ্রাম যাবে জলের তলে, একচল্লিশটি গ্রাম হবে আধডোবা। আদিবাসীরা হারিয়ে ফেলবে নিজস্ব জমি, বাসভূমি, অরণ্য, সমাজ, সংস্কৃতি। সরকার তাদের জমির জন্য অর্থ বরাদ্দ করলেও তার শতকরা নিরানব্বই ভাগ যাবে দিকুদের পকেটে। আদিবাসীরা তাই নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, অস্তিত্ব রক্ষার্থে ‘চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি’ গড়ে তোলে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ছোটনাগপুরে উইলকিনসি ব্যবস্থা চালু হয়। এছাড়া সেখানে চলে প্রজাস্বত্ব আইন (১৯০৮)। ফলে এখানকার জমির অধিকার মানকি, মুণ্ডার। তাই সরকার ছোটনাগপুর অঞ্চলে গ্রাম প্রধান মানকি, মুণ্ডা ও অন্যান্য আদিবাসীদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সরকারি প্রকল্প শুরু করতে পারে না। কোলহানের একাংশ যেহেতু ছোটনাগপুরের অন্তর্গত, সেহেতু সেখানেও চলে প্রজাস্বত্ব আইন। কিন্তু ৪৮০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার চেরো বাঁধ প্রকল্প মন্ত্রী ও ঠিকাদারের কাছে কোহিনুর স্বরূপ। তারা এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে বড্ড পরিকর। ফলে প্রয়োজন হয় সংঘর্ষ সমিতির প্রতিনিধি সুরজকে মেরে ফেলার। বাঁধ প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে আদিবাসী কর্মচারী চারিদিকে দেখে শুধু সুরজকে। মৃত্যুর পরেও সে প্রশাসনকে অনেক বেশি জ্বালায় এবং বিরসা সেতুর গায়ে অসীম ঔদ্ধতে লেখা হয়—

“সুরজ গাগরাইয়ের ভস্মাবশেষের মধ্যে বহু কাচের ও ধাতুর কুচি পাওয়া গিয়েছিল কেন, ডি এস পি জবাব দাও।”^৯

শত পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যেও অনার্য হো-রা তাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক মূল ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রশাসন, লোভী পুঁজিবাদী সমাজ এবং দিকুরা তাদের মানুষ বলে গণ্যই করে না। তারা যে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরীক একথা তারা যেন ভুলে যায়। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী তাদের ভুলেননি। আদিবাসী হো-রাও যে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির একাংশ, এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সকল ভারতবাসীর কর্তব্য এবং প্রশাসন যাতে উদাসীনতা মুছে ফেলে তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব, এবং উদারতার সাথে তাদের গ্রহণ করে সেই বার্তা দিয়েছেন।

ফলাফল ও ব্যাখ্যা : বিভিন্ন কোণিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে মহাশ্বেতা দেবী রচনা করেছেন ‘সুরজ গাগরাই’ উপন্যাস। তিনি অনার্য হো জনজাতির জীবন-জীবিকা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, পাল-পার্বণ-প্রথা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তারা সাধারণত অরণ্যে বসবাস করে। বনের অনূর্বর মাটিতে কৃষিকাজ ও বনজ ফলমূল সংগ্রহ করে যুগ যুগ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলে, দেশের সাধারণ নাগরিক হিসাবে তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। উপরন্তু প্রশাসন, সরকার, পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী সমাজের করাল গ্রাসে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। দিকু, মহাজনেরা আদিবাসী হো-দের নিজস্ব ভূমি কোলহানের অফুরন্ত ও বিশাল খনিজ সম্পদে থাকা বসায় ও ইচ্ছামতো ভোগ সাধন করে। সিমঝেরা পাহাড় ও নীচের শালবন কেটে অধিক মুনাফা লাভ করে। তাদের পবিত্র, বনজঙ্গল ধ্বংস করে জীবিকার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। গ্রাম দেবতা ও পবিত্রতার প্রতীক স্বরূপ প্রাচীন শাল গাছ কাটতে অগ্রসর হলে পঁচিশটি গ্রামের আদিবাসীরা সম্মিলিত ভাবে তির, ধনুক নিয়ে অগ্রসর হয়। অভাবে-অনটনের দিনে দিকুরা আদিবাসীদের টাকা ধার দিয়ে কয়লা খাদানে নিয়ে কুলি মজুরের কাজে লাগার। অর্থের প্রলোভনে মেয়েদের ইজ্জত লুণ্ঠ করে। তাদের জীবনের সার্বিক উন্নতির সরকার প্রদত্ত বরাদ্দ টাকা প্রশাসন ও এম এল এ ভোগ করে। উপরন্তু সুবর্ণরেখা বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে সরকার বদ্ধ পরিকর দেখালে আদিবাসীদের অস্তিত্ব গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে। কেননা এই প্রকল্প চারটি বাঁধ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গঠিত।

চেরো বাঁধ প্রকল্প এদের মধ্যে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্পের ফলে রাজনগর, পোটকা, গামহারিয়া, চাইবাসা প্রভৃতি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা চাষের জল পাবে, কৃষি কাজের উন্নতি হবে। কিন্তু এর বিপরীতে একুশ হাজার একর আদিবাসী জমি জলমগ্ন হবে। একষট্টিটি গ্রাম ধ্বংস হবে। অথচ, একথা প্রশাসন আদিবাসীদের জানানো প্রয়োজনবোধ করে না। ফলত, ধ্বংস হবে আদিবাসী হো সমাজ ও সংস্কৃতি। তাদের ছাড়তে হবে নিজস্ব ভিটেমাটি, পবিত্র স্থান সিমঝেরা পাহাড় ও শালবন। জীবন-জীবিকা, বাসস্থান, সমাজের বন্ধন ও সংস্কৃতি ত্যাগ করে তাদের পথে নেমে আসতে হবে। সবকিছু হারিয়ে নিরুপায় হয়ে বেড়িয়ে যেতে হবে নিরুদ্দেশের পথে। অথচ এরাও স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। এরাও নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি, রীতি-নীতি-পাল-পার্বন-প্রথা নিয়ে বেঁচে থাকার সমান পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু প্রশাসনের কাছে এসবের কোন মূল্য নেই। তাই নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে হো-রা সম্মিলিত ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু তাদের অভিযোগ প্রশাসনের কাছে ভিত্তিহীন বলে প্রতিফলিত হয়। ফলত, প্রাণ হারাতে হয় চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতির মহাসচিব সুরজ গাগরাইকে। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও স্বাধীন ভারতের প্রশাসনের কাছে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি অস্তিত্ব মূল্যহীন বলে প্রতিফলিত হয়।

উপসংহার : সমাজ ও সংস্কৃতি যে-কোন জাতির পরিচয় বহন করে। সমাজ ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেই যেকোন জাতি বেঁচে থাকে। সংস্কৃতির অনুশীলনের দ্বারাই জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের গতি লাভ করে। কেননা সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলন মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ ও গতিময় করে তোলে। অনার্য হো জাতির মানুষেরাও দীর্ঘদিন ধরে সিংভূমের বনে-জঙ্গলে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে বসবাস করে আসছে। কিন্তু কোলহানের বিশাল ও অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের জীবনে বাঁধা হিসাবে দেখা দেয়। কোলহানের প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের নিজের হলেও তারা ব্যবহার করতে পারে না। বাইরের পুঁজিবাদী শক্তি তা ভোগ করে। উপরন্তু সুবর্ণরেখা নদী বাঁধ প্রকল্প তাদের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে নিয়ে আসে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে। কিন্তু স্বাধীন ভারতীয় সরকারের থেকে কোন ফল পায় না। অথচ তারাও স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। স্বাধীন ভাবে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকার তাদের নিজস্ব অধিকার আছে। কিন্তু তা থেকে হো-রা বঞ্চিত। মানবদরদী, জনদরদী, সংবেদনশীল মহাশ্বেতা দেবীর হৃদয়ে হো-দের জীবনযাত্রা গভীর নারা দেয়। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন। ফলত, তাঁর কলমে ধরা পড়ে আন্দোলনরত মানুষের বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর তথা সামাজিকতা, মানবিকতা ও গভীর মূল্যবোধ।

Reference:

১. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র-১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৪৫
২. মণ্ডল, অমলকুমার, ভারতীয় আদিবাসী, দেশ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২৪, পৃ. ৭৩ - ৭৪
৩. চৌধুরী, অরুণ, আদিবাসী জীবন ও সংগ্রাম, গাঙচিল, কলকাতা, ২০২৪, পৃ. ৮২
৪. সেন, শুচিত্রত, ভারতের আদিবাসী, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২৪, পৃ. ১৫৮
৫. তদেব, পৃ. ১৫৯
৬. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র-১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৬৬
৭. তদেব, পৃ. ১৬০
৮. তদেব, পৃ. ১৮২
৯. তদেব, পৃ. ১৮২